প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার দর্শনে মুক্তির ধারণা

তানভীর আহমেদ*

[**সার-সংে প :** ভারতীয় দর্শন তথা বাংলা অঞ্চলের দর্শন পর্যালোচনা করলে অন্যতম প্রধান যে বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় তা হচ্ছে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ। বাংলার দর্শন চিন্তা মূলত মুক্তি বা মোক্ষ লাভকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে; মোক্ষ লাভকে উদ্দেশ্য হিসেবে সামনে রেখে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব, বিকাশ এবং পরিণতি ঘটেছে। মুক্তির ধারণা আমাদের এ অঞ্চলের একেবারেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ অব্দের দিকে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। আর্যদের আগমনের পর আমাদের অঞ্চলের স্থানীয় যে জনগোষ্ঠী ছিল অর্থাৎ অনার্যদের সাথে আর্যদের সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটে এবং একে অন্যের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এভাবে বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর দর্শন ও চিন্তার মিথস্ক্রিয়া ঘটে এবং উদ্ভব হয় নতুন নতুন সম্প্রদায়ের। এসব সম্প্রদায়ের চিন্তায় মুক্তির ধারণা কিভাবে স্থান পেয়েছে সেটাকে উপস্থাপন করাই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।]

বাংলা অঞ্চলের দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোর তত্ত্ব ও চিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রতিে ত্রে মো বা মুক্তি লাভ ছিল তাদের দর্শনের মূল ল ্য এবং দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। ভারতবর্ষে তত্ত্বজ্ঞান যতদূর পৌঁছেছে, কর্মকেও ততদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে তত্ত্বের সাথে কর্মের কোন ভেদাভেদ তৈরি করা হয়নি। এজন্য আমাদের অঞ্চলে কর্মই ধর্ম। আমরা বলি, মানুষের কর্মমাত্রের চরম ল ্য হচ্ছে কর্ম হতে মুক্তি এবং মুক্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করাই হচ্ছে ধর্ম (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৯৯ : ১১)। পাশ্চাত্যের দর্শন চিন্তার সাথে ভারতীয় তথা বাংলার দর্শনের মূল পার্থক্য এখানেই। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের চিন্তার এবং দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যের কারণ নির্দেশ করা সহজ নয়। আমরা কেবল প্রাচ্যের সমাজ কাঠামোর দিকে দৃষ্টি দিলে অনেক কথাই স্পষ্ট হয়ে আসে। কারণ ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে। যারা ছিল বিশেষ করে পাশ্চাত্যের জাতিগোষ্ঠী। যেমন-আর্যভাষীদের থেকে শুরু করে সর্বশেষ বৃটিশদের আগমন এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, জ্ঞানতাত্ত্বিক বিভিন্ন

* **তানভীর আহমেদ:** বি.এ. (অনার্স), এম.এ. (দর্শন বিভাগ), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রেক্ষাপটকে প্রভাবিত করেছে। ভিনদেশী জাতিগোষ্ঠী এ অঞ্চলে উপনিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং সেই সাথে প্রভাব বিস্তার করেছে ভারতবর্ষের মানুষের চিন্তাধারায়। আর্যভাষীদের থেকে শুরু করে যতসংখ্যক অন্য অঞ্চলের মানুষ আমাদের অঞ্চলে এসেছে প্রতিক্ষেত্রেই তাদের সংস্কৃতির সাথে আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের সংস্কৃতির বিনিময় ঘটেছে এবং একই সাথে ঘটেছে আমাদের সাথে তাদের চিন্তা ও দর্শনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। প্রাচ্যের দর্শনে সমস্ত জিজ্ঞাসা আবর্তিত হয়েছে পার্থিব জগতকে কেন্দ্র করে। এই জীবনকে মনে করা হয় কর্মফল। ভারতীয় দর্শনে জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলবাদ সেজন্যই এত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছে (মফিজ উদ্দীন আহমদ, ১৯৯৪ : ৩২)। বাংলা অঞ্চলে যে কয়টি প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায় দেখা যায় যেমন- তন্ত্র, সহজিয়া বৌদ্ধমত, সূফী দর্শন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এদের প্রত্যেকের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে আমাদের এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের জগৎ পরিত্যাজ্য-যুক্তিতে সত্য মেলে না। সত্য মেলে উপলব্ধিতে, বিশ্বাসে, ভক্তিতে, ভালবাসায় কিংবা পরমের সাথে নিজেকে একীভূত করার মাধ্যমে। এভাবে প্রত্যেকটি দার্শনিক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ উপায়ে মুক্তির সন্ধান করেছে। এদের বিভিন্ন সম্প্রদায় আবার কালের বিবর্তনে একে অন্যের দার্শনিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যার বদৌলতে এক সম্প্রদায়ের মুক্তির ধারণার সাথে অপর সম্প্রদায়ের মুক্তির ধারণার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

'প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার দর্শন'- এই অংশটি বুঝতে হলে উপনিবেশকাল এবং ঐ সময়ে বাংলা অঞ্চল বলতে কোন কোন ভূখণ্ডকে বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে অখণ্ড বাংলার যে ভৌগোলিক সীমানা, ঠিক এই রূপটি আদিতে এমন ছিল না। এই অঞ্চলটি বিভক্ত ছিল আলাদা আলাদা নামের অধীনে। এখন আমরা যে স্থানটিকে বাংলা অঞ্চল বলে চিহ্নিত করছি তা মূলত নির্দেশ করেছে প্রাচীন বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, বরেন্দ্র, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বারক, কঙ্কগ্রাম, বর্ধমান, কজঙ্গল, দণ্ডভুক্তি, খাড়ি, নাব্য ইত্যাদি অঞ্চল বা জনপদকে (অতুল সুর, ২০০৮: ২৭)।

আবার সাধারণ অর্থে উপনিবেশ বলতে আমরা বুঝি কোন জাতিগোষ্ঠীর অন্য কোন রাষ্ট্র বা জাতিগোষ্ঠীর উপর সরাসরি সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের উপর সার্বিক অধিগ্রহণ করা। এ প্রক্রিয়াকে উপনিবেশায়ন বলে চিহ্নিত করা হয়। ষোড়শ শতকের পর থেকে ইউরোপীয়দের হাত ধরে ভারতবর্ষ তথা বাংলা অঞ্চলে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর আগেও বাংলা অঞ্চলে যে জাতিগোষ্ঠীর আগমন হয়েছে তারাও উপনিবেশ স্থাপন করেছে। তবে উক্ত প্রবন্ধে প্রাক-উপনিবেশ বলতে ইউরোপীয় উপনিবেশের পূর্ব অবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় যেসকল দার্শনিক সম্প্রদায় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মত হচ্ছে তন্ত্রমত। পরবর্তীতে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৫০০

অব্দের দিকে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে আর্যদের সাথে আমাদের অঞ্চলের স্থানীয় যে জনগোষ্ঠী ছিল অর্থাৎ অনার্যদের সাথে আর্যদের সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটে এবং একে অন্যের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এছাড়াও বাংলায় সূফীবাদের প্রতিষ্ঠা পায় আরবের সূফীদের আগমনের মাধ্যমে। এভাবে বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর দর্শন ও চিন্তার মিথস্ক্রিয়া ঘটে এবং তৈরী হয় নতুন নতুন সম্প্রদায়।

বাংলা অঞ্চলে মুক্তির ধারণা

বাংলার দর্শন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। মুক্তি লাভ বা মো লাভ হচ্ছে সেই লক্ষ্যের পরিণতি। দর্শনকে একসময় 'আধ্যাত্মবিদ্যা' বা 'মো শাস্ত্র' বলা হতো। মো শাস্ত্রের দুই প্রকার উদ্দেশ্য ছিল। একপ্রকার, জগতের নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে পরামর্শ বা সত্য সম্বন্ধে অভ্রান্তভাবে কি জানা যায় তা নির্দেশ করা এবং তা প্রচার করা। দ্বিতীয় প্রকার, কি উপায়ে মানুষ তার জীবনে সত্যকে সাক্ষাৎ করতে পারে বা জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা হতে ত্রাণ পেতে পারে অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ে উপদেশ দেয়া এবং কিভাবে জগতের বন্ধন হতে মুক্তি পাওয়া যায় সেটির নির্দেশনা দেয়া (ড. সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ২০০৪: ৯)। বাংলা অঞ্চলে আমরা যাকে ধর্ম বলি তা আসলে এসকল দার্শনিক ধারারই ফলাফল। আমাদের অঞ্চলে ধর্মকে কখনো জীবনের সাধন-পদ্ধতির থেকে আলাদা করে দেখা হয়নি। ধর্ম কথাটির সাথে পাশ্চাত্যের 'রিলিজিওন' (religion) শব্দটির তুলনা করা হলেও তা কখনোই এক নয়। "ধর্ম বলতে আমাদের এ অঞ্চলে মানুষ কেবল প্রার্থনা ভক্তিভাব এবং শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলাকে বোঝায় নি; বরং জীবন যা কিছুকে ধারণ করে ধর্ম বলতে বোঝাতো তার সবটাকেই। সংসার ধর্ম, দয়াধর্ম, প্রেমধর্ম, সেবাধর্ম, কথাগুলো এই ব্যাপকতাকে নির্দেশ করে। সমস্ত জীবনই ধর্মক্ষেত্র, কেবল জীবন বিরুদ্ধ ব্যাপারগুলোই অধর্ম। এজন্য এখানে ধর্মাধর্মের বাইরে বলে কিছু নাই" (রায়হান রাইন, ২০০৯: ৮)। ভারতবর্ষের মানুষ নানা চেষ্টা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধর্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করেছে। 'পলিটিক্স' (politics) এবং 'নেশন' (nation) যেমন ইউরোপীয় ধারণা, তেমনি ধর্ম ব্যাপারটিও বাংলা অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা। পলিটিক্স এবং নেশন শব্দের সমার্থক শব্দ যেমন বাংলা ভাষায় সম্ভব নয়, তেমনি ধর্ম শব্দটিকে পাশ্চাত্যের 'রিলিজিওন' (religion) শব্দের দ্বারা সমার্থক বলা যায় না (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৯৯: ৮)। আমাদের বাংলা অঞ্চলে ধর্ম শব্দটি প্রতিটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের সাথে সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাকে সাধনা করাই জীবনের ল ্য। অপরদিকে, রিলিজিওন (religion) বলতে পাশ্চত্যে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে যে জীবন ব্যবস্থার কথা বলা হয় তাকে বুঝায়।

বাংলা অঞ্চলের দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো ধর্মীয় রীতি, সাধনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনের মুক্তি খুঁজেছে। এ অঞ্চলের মানুষ মুক্তি লাভ করা বলতে জগতের সীমা অতিক্রম করাকে বুঝিয়েছে। বাংলা অঞ্চলের চিন্তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রশ্ন উঠেছিল এমনটি যে জগৎ কোথা থেকে আসে, কোথায় অবস্থান করে এবং কিসেই বা বিলীন হয়? এক্ষেত্রে উত্তর দেয়া হয়েছিল এমন যে - মুক্তি হতে এর উৎপত্তি, বন্ধনে এর স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই প্রত্যাবর্তন (স্বামী বিবেকানন্দ, ১৯৮০: ২৬০)।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সে সাধন-পদ্ধতি পরিচালিত হয়ে আসছে সেগুলোর স্বরূপ বা প্রকৃতি কী? উপনিবেশ পূর্ব বাংলায় মানুষের দার্শনিক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তৎপরতার অনুষঙ্গ হয়ে। সেজন্য দার্শনিক গোষ্ঠীগুলো এখানে পেয়েছে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পরিচয়। কীসে মানুষের মুক্তি?- বহু পুরানো এই প্রশ্ন, যে প্রশ্নকে ঘিরে বাংলার সাধক এবং ভাবুকগণ তাদের জীবনকে সত্যে প্রতিষ্ঠা দিতে খুঁজেছেন নানা উপায়। একই সাথে সত্য ধারণ করে বাঁচবার উপায় কি হবে তা বের করার প্রয়াজনেই তারা বুঝতে চেয়েছেন জগতের স্বভাবকে, তারা জানতে চেয়েছেন জীবাত্মা ও জগতের সঙ্গে পারমার্থিক সত্তা কীরূপে সম্পর্কিত। এভাবে মুক্তির উপায়ের প্রশ্নে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বস্তুর অধিবিদ্যা। একজন তান্ত্রিক সাধকের জন্য আত্ম অতিক্রমের পথ খুঁজে পেতে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে দেহের স্বভাবকে বোঝা। দেহ আশ্রয়ী জ্ঞান বিস্তৃত হয়েছে সৃষ্টি, প্রকৃতি ও প্রাণের রহস্যমোচনের দিকে। প্রজ্ঞা ও উপায়কে যুক্ত করে মুক্তি ও আনন্দকে পেতে সহজসত্তা অর্জন করতে চেয়েছেন বৌদ্ধ সহজিয়াগণ। আবার, নাগযোগীরা যোগবিভূতির কল্যাণে কিভাবে শুদ্ধ দেহ লাভ করে অমরত্বের পথ পাওয়া যায় সেটির তত্ত্ব ও পদ্ধতি বের করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মরমী সূফী সাধকগণ পরম ভাবের ভেতর নিজের সত্তার স্থায়িত্ব কীভাবে দেয়া যায় তার তত্ত্ব ও পদ্ধতি নিয়ে ভেবেছেন। ভক্তি আশ্রয়ী বৈষ্ণবগণ পরমের প্রকাশকে খুঁজেছেন মানব সম্পর্কের ভেতর, আবার মানব অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তূরীয় সত্তার ভেতর। বাউল সাধকগণ পরম ভাবকে প্রতিষ্ঠা দিতে এবং সেই ভাবের বিকাশ দেখতে চেয়েছেন। তারা পরমকে মানব দেহের সীমায় এনে সাধনার কেন্দ্রীয় বিষয় করে তুলেছেন মানুষকেই। এইসব সাধক সম্প্রদায়ের অন্বেষণ আমাদের দেখিয়েছে বাঁচবার জন্য ভাবনা ও বিশ্বাসের নানা দিগন্ত (রায়হান রাইন, ২০০৯: ফ্ল্যাপ্)। এক্ষেত্রে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলার দর্শনে বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়গুলো যেভাবে নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজেছে সেটির মূলত দুইটি দিক বা রাস্তা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে যথা- ১. জাগতিক মুক্তি এবং ২. পারমার্থিক মুক্তি।

জাগতিক মুক্তি: শাব্দিক অর্থে জাগতিক মুক্তি বলতে বুঝায় পার্থিব জগতের সুখ, কামনা-বাসনা থেকে নিবৃত্তির পথ খোঁজা। প্রাচীন বাংলায় দেহ সাধনা এবং দেহের মধ্যে জাগতিক মুক্তির ধারণা পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সাধক সম্প্রদায়গুলো দেহ সম্পকির্ত ভাবনাকে বৈশ্বিক চেতনার (cosmic consciousness) ভেতর অঙ্গীকৃত করেছেন এবং এই ভাবনা থেকেই নিঃসৃত হয়েছে তাদের সামাজিক চেতনা। সাধক ও ভাবুকদের আত্মসত্তার ধারণা গঠনে রয়েছে দেহ সম্পর্কিত বিশ্বাস। দেহকে তারা গ্রহণ করেছে আত্মোপলব্ধির সোপান বা সিঁড়ি হিসেবে। জাগতিক মুক্তি বলতে আমরা যে দেহ সাধনার কথা বলছি তার প্রাধান্য পাওয়া যায় অনার্য অধ্যুষিত বাংলার প্রাচীন সাংখ্যা, তন্ত্র ও যোগ ধর্মের সাথে। পরবর্তী সময়ে এ সম্প্রদায়গুলোর নিকট থেকেই দেহ সম্পর্কিত ধারণার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে বৌদ্ধ সহজিয়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, নাথযোগী, শৈব, শাক্ত, বাউল এবং বাংলা অঞ্চলে গড়ে ওঠা সূফী সম্প্রদায়গুলো। এজন্য এ সকল সম্প্রদায়ের মুক্তি বলতে জাগতিক মুক্তিকেই বুঝায়।

পারমার্থিক মুক্তি: শাব্দিক অর্থে পারমার্থিক বলতে বোঝায় পরম সংক্রান্ত, ব্রক্ষবিষয়ক বা আধ্যাত্মিক বিষয়। তাই পারমার্থিক মুক্তি হচ্ছে আধ্যাত্মিক মুক্তি। বাংলা অঞ্চলে এ পারমার্থিক মুক্তি বলতে এক অদ্বৈত অবস্থায় পৌছানোকে বোঝায়। এ ত্রে ব্যক্তিসত্তাকে পরমের সাথে মিশিয়ে এক করে দেখা হয়। এই ধরনের পারমার্থিক মুক্তির ধারণা পাওয়া যায় সহজিয়া বৌদ্ধমতে এবং বৌদ্ধ সাধকদের রচিত চর্যাপদের আলোচনায়। এরপর পাওয়া যায় বাংলা অঞ্চলের দুই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য শান্তরি ত এবং অতীশ দীপঙ্করের সত্য সম্পর্কিত আলোচনায়।

অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলের দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো কখনও জীবনের মুক্তির পথ খুঁজেছে জাগতিক উপায়ে বা দেহ সাধনার দ্বারা, আবার কখনও মুক্তি খুঁজেছে পারমার্থিকভাবে পরমকে ল ্য করে। আবার কোন কোন সম্প্রদায় জাগতিক মুক্তির পথ বা দেহ সাধনাকে মাধ্যম (means) ধরে পারমার্থিক মুক্তিকে ল ্য (goal) হিসেবে নিয়েছে। অর্থাৎ জাগতিক মুক্তি ও পারমার্থিক মুক্তি একসাথে নিবিড়যোগে যুক্ত থেকেছে মো লাভের ে ত্রে।

তন্ত্রদর্শন

বাংলার দর্শনের আলোচনায় সবচাইতে প্রাচীন যে মত তা হচ্ছে তন্ত্রমত। অনার্য অধ্যুষিত প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজে তন্ত্রমতের উদ্ভব। তান্ত্রিকরা দেহকে অবলম্বন করে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। তান্ত্রিকরা দেহকে অনুবিশ্ব হিসেবে দেখেছে, তাই তাদের কাছে দেহই জ্ঞানের অবলম্বন। তন্ত্রমতে দেহকে জানার মাধ্যমে প্রাণ এবং জগৎ-রহস্যকে আয়ত্ত করা যায়। এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য আত্ম-অতিক্রম। আত্ম-অতিক্রমের মাধ্যমে

ব্যক্তি নিজের বিশেষ অবস্থা থেকে নির্বিশেষ বিশ্বসত্তায় উপনীত হতে পারে। তাই দেহ হচ্ছে তান্ত্রিকদের কাছে আত্মমুক্তির উপায়।

তান্ত্রিকরা হলেন দেহাত্মবাদী। দেহাত্মবাদী মত অনুসারে 'আত্মা' দেহের মাঝে অবস্থান করে এবং দেহের ভেতরই পরমাত্মার অবস্থান। দেহের বাহিরে পরমের কোন উপস্থিতি নেই। দেহাত্মবাদীদের কাছে মানুষ হচ্ছে লক্ষ্য (goal)। দেহকে তারা মুক্তির সোপন হিসেবে ব্যবহার করেন। মানবদেহকে কেন্দ্র করে তান্ত্রিকদের মুক্তির পথ এবং পদ্ধতি আলোচনার ে ত্রে তন্ত্র কী? এবং গোড়ার কিছু কথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। স্বাভাবিক অর্থে তন্ত্র কি?-এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় তন্ত্র হচ্ছে একটি ধর্ম, যা বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ছিল। তন্ত্রমত প্রথম পাওয়া যায় জৈন দার্শনিকদের রচিত *সূত্রকৃতঙ্গ* নামক গ্রন্থে যেখানে অনার্য তথা প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মত পাওয়া যায়। তবে তন্ত্র বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধরা যার নাম *গুহ্যসমাজতন্ত্র* (অতুল সুর, ১৯৮৪: ৫১)। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে তন্ত্র কথাটির অর্থ করা হয়েছে, "যে কোন বস্তু বা বিষয়ে তদ্ বা তন্ যে প্রকৃয়ায় তার পরবর্তীরূপে তারিত হয়, উত্তীর্ণ হয়, ত্রাণ পায়, সেই প্রকৃয়াকে ধারণ করে যে ব্যবস্থা তাকে বলে তন্ত্র" (কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, ১৪১৬: ৪৫৮)। আবার তনু মানে হচ্ছে সত্তা। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ তন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন কিছুর সারসত্তা হিসেবে। এছাড়া কালিদাস রচিত *অভিজ্ঞানশকুন্তলম* গ্রন্থে বলা হয়- শাসন পরিচালনার পদ্ধতি বা জ্ঞানের পদ্ধতি বুঝাইতে তন্ত্র কথাটি ব্যবহার করা হয়। বেদান্ত দার্শনিক শংকরাচার্য 'তন্ত্র' কথাটিকে জ্ঞানের একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন- প্রজনন তন্ত্র, কংকাল তন্ত্র ইত্যাদি।

তান্ত্রিকদের দেহ সাধনা তথা মুক্তির পদ্ধতি বুঝতে হলে প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজের চিন্তা, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণাকে জানা প্রয়োজন। বৈদিক বিশ্বাস থেকে তন্ত্রমত আলাদা। অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে অনার্যদের এই মত ও ধর্মপদ্ধতিকে বলা হয়েছে ব্রাত্যধর্ম (অতুল সুর, ১৯৮৪: ৫১)। সমাজের প্রান্তে যারা বাস করতো (নিম্নবর্গের জাতি যারা ব্রতপালন বা উপবাস করত) তাদেরকে ব্রাত্য বলা হতো। কৃষিজীবী সমাজের মানুষ প্রাকৃতিক উৎপাদনের পেছনে সক্রিয় ধরিত্রীশক্তি এবং প্রাণ রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে জন্ম দিয়েছে একটি রূপকের যাতে ধরিত্রীদেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে মানবদেহকে। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ভূমিমাতার ধারণা পাওয়া যায়। ভূমির সক্রিয় শক্তির কারণেই প্রাকৃতিক উৎপাদনের ে ত্রে ভূমি এবং মানবীয় প্রজননের ে ত্রে মানবদেহ তুলনীয় হয়েছে। প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজে মানুষ প্রাণরহস্যের সন্ধান করেছে মানবদেহে। এই প্রাণরহস্যকেই তারা জগৎ-রহস্যের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে এবং রহস্যমোচনে মানবদেহই হয়েছে তাদের কাছে অবিদ্যা ও অজ্ঞতা দূর করার মাধ্যম (রায়হান রাইন, ২০১৯: ৭৩)।

মানবীয় প্রজনন এবং প্রাকৃতিক উৎপাদন যে একই সূত্রে গ্রথিত এই ধারণাকে অবলম্বন করে সাংখ্য এবং তন্ত্র দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষের ধারণা গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির রহস্য মানবদেহেরই রহস্য। কারণ মানবদেহই বিশ্বপ্রকৃতির সংক্ষিপ্তসার। এ কারণেই তন্ত্র সাধনায় দেহতন্ত্র এবং কাম সাধনার গুরুত্ব অপরিসীম। তন্ত্রমতে-

> "যা আছে দেহভাণ্ডে,
> তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।"

অর্থাৎ দেহরহস্যের মধ্যেই বিশ্বরহস্যের পরিচয় বা মূল সূত্র অনুমেয় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২০০৯: ৪৩)। দেহের বিকাশের জ্ঞান না জানলে ধরিত্রীর জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। তন্ত্র মতে, মানবদেহ একটি অনুবিশ্ব (microunivense)। অর্থাৎ বিশ্বে যা কিছু আছে তার সবাই বিদ্যমান মানবদেহে। তাই মানবদেহ হলো জগৎ-রহস্যের আধার।

তান্ত্রিকদের দেহসাধনা তথা মুক্তির উপায় বুঝতে হলে তাদের আরেকটি দার্শনিক তত্ত্ব বুঝতে হবে। এটি হলো 'কুণ্ডলিনীতত্ত্ব'। প্রাচীন তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনীতত্ত্ব দেহ সম্পর্কিত ধারণা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ধরিত্রীর শক্তি শরীরে কুণ্ডলি আকারে থাকে তাই একে বলা হয় কুণ্ডলিনীতত্ত্ব। তন্ত্র শাস্ত্রে মহাকুণ্ডলিনী হচ্ছে মহাবিশ্বের শিকড়। একে অর্জন করার মাধ্যমে একজন তান্ত্রিক সাধক তাঁর ব্যক্তিক অবস্থা অতিক্রম করে সর্বব্যাপ্ত হতে পারে। একজন কুণ্ডলিনী সাধক যখন দেহ এবং চেতনার মাধ্যমে সাধনা করেন, তখন তিনি দেহ ও চেতনার মধ্যে সম্মিলন ঘটান। কুণ্ডলিনী বলতে তান্ত্রিকরা এমন একটি আধার শক্তিকে বুঝিয়েছে যা সমস্ত পদার্থকে আশ্রয় দিয়েও সব পদার্থের সারসত্তারূপে বর্তমান থাকে (রায়হান রাইন, ২০১৯: ৭৫)। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি কুণ্ডলিনী জাগরণেরই অবস্থাভেদ মাত্র। যখন জাগরণ সম্পূর্ণ হয়, যখন নিদ্রা এবং লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না, তখনই পরিপূর্ণ অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ হয়। কুণ্ডলিনীর অপর নাম আধারশক্তি-যে শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় দিয়ে সকল পদার্থের মূলসত্তারূপে বর্তমান থাকে।

এভাবেই প্রাণরহস্যকে জগৎ-রহস্যের কেন্দ্রে নিয়ে এসে তান্ত্রিকরা মানবদেহকে অবিদ্যা ঘোচানোর মাধ্যম হিসেবে নিয়েছেন। তন্ত্রমতে দেহের জ্ঞানকে জানার মাধ্যমে প্রাণ ও জগৎ-রহস্যকে আয়ত্ত করা যায়। এই জ্ঞানের উদ্দেশ্যে হচ্ছে আত্ম-অতিক্রম। আত্ম-অতিক্রম হলো নিজের সীমানাকে ছাড়িয়ে যাওয়া। তান্ত্রিক সাধকগণ মনে করতেন তারা মৃত্যুকে দমিয়ে রাখতে পারে। ব্যক্তি আত্ম-অতিক্রমের মাধ্যমে নিজের বিশেষ অবস্থা থেকে নির্বিশেষ বিশ্বসত্তার উপনীত হতে পারে, তাই দেহ-ই হচ্ছে তান্ত্রিকদের কাছে মুক্তির মাধ্যম। তান্ত্রিকদের নিকট থেকেই পরবর্তীতে দেহ সম্পর্কিত ধারণার উত্তরাধিকার গ্রহণ করে বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথযোগী, শৈব-শাক্ত, বাউল এবং বাংলা অঞ্চলের সূফী সম্প্রদায়গুলো।

সহজিয়া বৌদ্ধমত

সহজিয়া বৌদ্ধমত হলো মহাযান ধারার একটি উপধারা। গৌতম বুদ্ধের (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিঃ পূঃ) মৃত্যুর পর বৌদ্ধমত বিবর্তিত হয়ে অনেকগুলো উপধারা সৃষ্টি করে। বৌদ্ধমতের একটি সহজ ধারা এবং সহজ বোধগম্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর লক্ষ্যে সহজিয়া বৌদ্ধমতের উদ্ভব। বৌদ্ধ দর্শনে মুক্তি বা মো লাভকে বলা হয় 'নির্বাণ'। নির্বাণ হলো ভবচক্র থেকে মুক্তির উপায়। প্রাচীন বৌদ্ধমতে সাধকরা যেমন নির্বাণ লাভের মাধ্যমে মুক্তি বা মো লাভের পথ খুঁজেছে, তেমনি সহজিয়া বৌদ্ধমতের অনুসারীগণ নির্বাণ লাভ করতে চেয়েছেন সহজ পথ অবলম্বন করে।

তিব্বতী অনুবাদের উপর ভিত্তি করে 'সহজ' শব্দের অর্থ করা যায় সহ-র সঙ্গে যার জন্ম অথবা সহ নিয়ে যার জন্ম। তিব্বতী শব্দটি হচ্ছে 'Ihan-cig skyes-Pa' যেটিকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনুবাদ করেছেন I'Inne বলে। তিব্বতী ভাষা গবেষক David Snellgrove এটির অনুবাদ করেন the innate, যার অর্থ হচ্ছে সহজাত বা অন্তর্জাত। বলা যেতে পারে এটা একটি শূন্য অবস্থা, সকল প্রকার দ্বৈততা স্বীকার করে শূন্যরূপ অস্তিত্বে প্রবেশ করার একটি পদ্ধতি (সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৮৪: iv)।

শাব্দিক অর্থে 'সহজ' মানে সাদামাটা (simple) বা একক (singular)। সহজিয়াদের সাধন-পদ্ধতি এবং মুক্তির পথ বিশ্লেষণ করলে 'সহজ' শব্দের অন্তর্নীহিত অর্থ উপলব্ধি করা যায়। 'সহজ'-কে বলা হয় মধ্যপন্থা, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মাঝামাঝি একটি অবস্থান। সহজিয়া সাধকদের কাছে এটি একটি শূন্য অবস্থা। সব ধরনের দ্বৈততার উর্দ্ধে উঠে শূন্যরূপ অস্তিত্বে প্রবেশ করার পদ্ধতি। এই সম্প্রদায়ের সাধকদের সহজিয়া বলার কারণ, তাদের সাধ্যবস্তু যেমন সহজ তেমনি তাদের সাধনপন্থাও সহজ। সহজিয়া সাধকরা বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক জীব এমনকি প্রতিটি বস্তুর মধ্যে একটি সহজ স্বরূপ আছে যা সব ধরনের পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তিত থাকে। সেই সহজ স্বরূপই তাদের সাধ্যবস্তু। সাধন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই সাধকগণ শাস্ত্রীর ধ্যান-পদ্ধতি, মন্ত্রপূজাচার ইত্যাদি বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ বাঁকা পথের চেয়ে উজুবাট বা সোজাপথ অবলম্বন করাকেই শ্রেয় মনে করেন। বৌদ্ধতন্ত্রেও 'সহজ'-কে স্বরূপ এবং এই স্বরূপকে নির্বাণ বলা হয়েছে (শশীভূষণ দাসগুপ্ত, ১৩৭৬: ৯০)।

সহজিয়া সাধকগণ এই 'সহজ'-কে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই নির্বাণ তথা মুক্তি লাভ করতে চেয়েছেন। নির্বাণ লাভ করতে গেলে জ্ঞানের প্রত্যয়কে রুদ্ধ করতে হয়। ভেদ এবং অভেদের উর্ধ্বে উঠতে হয়। সাধারণত জ্ঞান হতে গেলে পাঁচটি প্রত্যয় লাগে। এগুলো হলো শ্রুতি প্রত্যয়, স্বাদ প্রত্যয়, দৃষ্টি প্রত্যয়, স্পর্শ প্রত্যয় এবং ঘ্রাণ প্রত্যয়। এই পাঁচটি হচ্ছে ইন্দ্রিয় প্রত্যয়। তবে এর সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্থান এবং কালের ধারণা। তবে জ্ঞান হতে গেলে আরও দুটি প্রত্যয়ও প্রয়োজন, এগুলো হচ্ছে মিল-অমিলের ধারণা বা ভেদ-অভেদের জ্ঞান। অর্থাৎ কোন বিষয়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারার ক্ষমতা। ভেদ ও অভেদের ধারণা না থাকলে জ্ঞান সক্রিয়ই হবে না।

সহজিয়া মতানুসারে নির্বাণ তথা মুক্তি লাভ করতে হলে জ্ঞানের এই প্রত্যয়গুলোকে রুদ্ধ করতে হবে। ভেদ ও অভেদের উর্দ্ধে উঠতে হবে। সমস্ত বিকল্পের উর্দ্ধে উঠে একটি অবিকল্প অবস্থা হচ্ছে সহজাবস্থান। অর্থাৎ 'সহজ' অবস্থায় পৌঁছানোকে এক প্রকারের মানসিক অবস্থাও (state of consciousness) বলা চলে।

মহাযান বৌদ্ধমত থেকে উদ্ভূত এই সহজিয়া সাধকগণ তাদের সাধন-পদ্ধতির অনেক দিকই বৌদ্ধতান্ত্রিকদের থেকে গ্রহণ করেছেন। তবে তান্ত্রিকদের সাধনায় যেসব বাহ্যাড়ম্বর আছে বৌদ্ধ সহজিয়াগণ তা গ্রহণ করেননি। তান্ত্রিকরা দেহকে মাধ্যম ধরে এর ভেতর দিয়েই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে চান। দেহসাধনার মাধ্যমে সহজানন্দরুপ পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ দেহের ভেতর চারটি চক্র বা পন্থা কল্পনা করেছেন। বৌদ্ধতন্ত্রের চক্রগুলো হলো: নির্মাণচক্র, ধর্মচক্র, সম্ভোগচক্র এবং মহাসুখচক্র। দেহের মধ্যে এদের অবস্থান যথাক্রমে নাভি, হৃৎপিন্ড, কণ্ঠ এবং মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কে অবস্থিত চক্রই সহজিয়াদের 'সহজচক্র' (রায়হান রাইন, ২০১৯: ১৯১)।

সহজিয়া বৌদ্ধমত এবং সহজিয়া সাধকদের সাধন-পদ্ধতি কিরূপ ছিল তা জানার অন্যতম উৎস হচ্ছে চর্যাপদ। সহজিয়া সাধকগণ 'সহজ'-কে পাওয়ার জন্য কিভাবে সাধনা করেছেন এবং কিভাবে নির্বাণ লাভ বা মো লাভ করা যার তার বিভিন্ন কৌশল চর্যাপদের লেখকগণ লিখে গেছেন রূপকী গান বা কবিতার ভাষায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়* নামের বৌদ্ধমতের অতি পুরানো বাংলা গানের একটি সংকলন একত্রে প্রকাশ করেন যা *চর্যাপদ* নামেই বর্তমানে পরিচিত। চর্যাপদের চর্যাগুলো রচিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। চর্যাপদে ২২ জন পদকর্তার পূর্ণাঙ্গ ৪৬টি এবং অপূর্ণাঙ্গ ১টি চর্যা রয়েছে। চর্যাপদের রচয়িতাদের বাংলাদেশ এবং তিব্বতে 'সিদ্ধাচার্য' বলা হয়। চর্যাগীতিকায় মোট তেরটি ে ত্রে 'সহজ' শব্দটি এসেছে (সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৮৪: iv)।

চর্যাপদের বিভিন্ন চর্যা বিশ্লেষণ করলে সহজিয়া সাধকদের সাধন-পদ্ধতির স্বরূপ কেমন এবং তারা কিভাবে 'সহজ'-কে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তা দেখানো যায়। যেমন- চর্যাপদগুলোর রচয়িতা বৌদ্ধ সহজিয়াদের লক্ষ্য চিত্ত বা চেতনাকে সাংবৃতিক অবস্থা থেকে পারমার্থিক অবস্থায় উন্নীত করা। কারণ প্রকৃতিদোষ এবং অবিদ্যার প্রভাবে চেতনা নিজেই প্রাতিভাসিক জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করে। দ্বৈতাভাস-দোষে চিত্ত চঞ্চল হয় এবং এই চঞ্চল অবস্থা থেকে আমাদের মধ্যে কালবোধ জন্মে এবং এ থেকেই প্রবৃত্তিমূলক সংসার জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই চঞ্চল চিত্তকে সহজ করতে হলে অর্থাৎ কালের কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে চিত্তকে মহাসুখের মাঝে বিলীন করতে হবে। প্রথম চর্যাতে যেমন লুইপা বলছেন-

"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল

চঞ্চল চীত্র পাইঠা কাল।।"
(১ নং চর্যা)

অর্থাৎ দেহ হচ্ছে তরু বা বৃক্ষের সদৃশ এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় হচ্ছে তার পাঁচটি ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হলো। এই চর্যায় আমরা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়েই যে আমাদের দেহ এবং সেই দেহের মধ্যে সে পুদ্‌গলরূপী একটি অহংপ্রীতি গড়ে ওঠে এই সত্যের আভাস পাই। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতে কেবল প্রবৃত্তিমূলক জাগতিক জ্ঞানে যেমন সহজানন্দ নেই, তেমনি নিবৃত্তিমূলক শূন্যতাতেও সুখের অবস্থান নেই। এই দুইয়ের সমন্বয়ে সহজরূপ মহাসুখের উপলব্ধি হয়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কালের কবল থেকে মুক্তির জন্য উত্তম সুখকে আবিষ্কার করা।

আবার সহজিয়া বৌদ্ধগণ ছিলেন শূন্যবাদী। মোক্ষ লাভ তথা নির্বাণ লাভের জন্য তারা শূন্যতাকে অবলম্বন করতে বলেছেন। যেমন- সপ্তম চর্যায় কাহ্নপাদ বলছেন-

"তে তিনি তে তিনি হো ভিন্না।
ভনই কাহ্ন ভব পরিচ্ছিন্না।।
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অব গাগবনে কাহ্ন বিমন ভইলা।।"
(৭ নং চর্যা)

অর্থাৎ "তারা তিন (কায়, বাক, চিত্ত) তারা তিন-তিনই ভিন্ন। কাহ্ন বলেন, ভব পরিচ্ছিন্ন। যে যে এল সে সে গেল। আসা যাওয়াতে কাহ্ন বিমনা হলেন" (সৈয়দঃ ৬৬)। কাহ্ন বলছেন, একটা অনাদি অবিদ্যাজনিত মায়ার স্বপ্নে প্রতিভাত এই ভব-জলধি। আর সেই অনিত্য শূন্য স্বরূপকে উপলব্ধি করেই তাকে হেলায় অতিক্রম করে যেতে হবে। সিদ্ধাচার্যগণ মুক্তি লাভের জন্য শূন্যতার কথা বলছেন এবং সেই চিত্তের কথা বলছেন যে চিত্ত শূন্যতার পথে মানব মনকে প্রভাবিত করে।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ মুক্তি লাভের জন্য পার্থিব মোহ থেকে মুক্তির কথা বলেন, ৫ নং চর্যায় চাটিল্লপা বলেন-

"ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মজেঝ ন থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গাঢ়ই
পারগামি লোঅ নিভর তরই।।
ফাড্ডিঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোড়িঅ।।"
(৫ নং চর্যা)

অর্থাৎ "ভবনদী অতিময় গহীন এবং অত্যন্ত গম্ভীর বেগে প্রবাহমান। এর উভয় তীর অতিশয় পিচ্ছিল এবং মধ্যদেশে অথই। চাটিল্লপা ধর্মের সাঁকো নির্মাণ করেছেন। পারাপার গমনে সমুৎসুক মানুষ নির্ভয়ে নদী উত্তীর্ণ হচ্ছে। মোহ তরু বিদীর্ণ করে তার সঙ্গে পাটক সংযুক্ত কর" (সৈয়দঃ ১৮)। এখানে পদকর্তার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে পৃথিবীতে অকুশলতা সর্বত্র বিরাজমান। লোভ আছে, ভয় আছে, সংস্কার আছে, মিথ্যা আছে, দ্বেষ আছে। এ সমস্ত কিছু মিলে পৃথিবীর পথ পিচ্ছিল হয়েছে। যিনি মুক্তিকামী এবং মো লাভ করতে চান তাঁকে সমস্ত কিছু উত্তীর্ণ হতে হবে। মোহ থেকে মুক্তি লাভ প্রয়োজন এবং মোহমুক্তির পর পার্থিব যন্ত্রণা অতিক্রান্ত হলে সে নির্বাণ লাভ করবে।

বৌদ্ধ সহজিয়ারা মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে শূন্যতাকে উপলব্ধি করার কথা বলেছেন। তাবে তাদের ভাষায় এই শূন্যতা মূলত পূর্ণতারই নামান্তর। যেমন- ৪২নং চর্যায় কাহ্নপাদ বলছেন-

"চিঅ সহজে সুন সুংপুন্না
কান্ধোবিয়োগএঁ মা হোহি বিসন্না।"
(৪২ নং চর্যা)

অর্থাৎ, চিত্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে শূন্য দ্বারা গঠিত। পঞ্চস্কন্ধ বিয়োগে কাতর হওয়া যাবে না। শূন্যতাকে এই চর্যায় কাহ্নপা বলছেন, শূন্যতা আসলে শূন্যতা নয় বা শূন্যতা মানে বিলীন হয়ে যাওয়া নয় বরং তা পূর্ণতারই নামান্তর। মৃত্যুতে সব শেষ নয়, মৃত্যুতো কেবল স্থূল দেহের অবসান এবং পঞ্চস্কন্ধের বিয়োগ হয় মাত্র। এই স্কন্ধ বিয়োগের পরেও থাকে আনন্দময় 'সহজ স্বরূপ', যা আসলে শাশ্বত অস্তিত্ব। অর্থাৎ শূন্যতা আসলে শূন্যতা নয়, তা আসলে পূর্ণতারই নামান্তর। সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই সেই পূর্ণতম অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের মতে মহাসুখরূপ সহজের উদ্ভব ঘটে 'প্রজ্ঞা' এবং 'উপায়'-এর সংযোগের মাধ্যমে। এখানে প্রজ্ঞা হচ্ছে শূন্যতার জ্ঞান এবং উপায় হচ্ছে করুণা। সহজিয়া সাধকগণ বলেন- প্রজ্ঞা এবং উপায়ের সংযোগে বোধিচিত্ত লাভ ঘটে বা বিলোপ ঘটে সংসার জ্ঞানের। এতে সাধকের চিত্তে আত্ম-পর ভেদ বিলুপ্ত হয় এবং তার সংস্কার বিনষ্ট হয়। জগৎ যে শূন্য স্বভাবের এই জ্ঞানকে বৌদ্ধ সহজিয়ারা বলছেন 'প্রজ্ঞা' এবং সকল জীবের প্রতি করুণা অবলম্বনকে বলছেন 'উপায়'। উপায় এবং প্রজ্ঞা মিলেই 'সহজ' প্রাপ্তি ঘটে। এই সহজপ্রাপ্তিই হচ্ছে সহজিয়াদের কাছে মুক্তি লাভের উপায়।

বৌদ্ধমতে আদিতে যা ছিল নির্বাণ ক্রমশ তা অর্হতত্ত্ব, বোধিচিত্ত, বোধিসত্ত্ব, বজ্রসত্ত্ব, ইত্যাদি রুপ লাভ করে এবং তা বৌদ্ধ সহজিয়াদের কাছে হয়ে যায় 'সহজাবস্থা' (রায়হান রাইন, ২০১৯: ৮৪)। তাদের মতে এই শরীরী অবস্থায় পৌঁছালে বিরোধাভাস মুক্ত হয়ে জগতের গতি রুদ্ধ হয় এবং সহজিয়া সাধক এক অদ্বৈতাবস্থায় পৌঁছেন।

সহজাবস্থা নির্বাণের মতো এক স্তর, এর উৎস হচ্ছে শরীর, কিন্তু পরবর্তীতে ক্রমশ এই অবস্থাটি সহজিয়া সাধকদের কাছে চূড়ান্ত কাম্যবস্তু হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সাধকদের কাছে লৌকিক জগৎ তখন ধীরে ধীরে গৌণ হয়ে ওঠে। 'সহজ'-কে তারা গণ্য করেন পরম বলে। কিন্তু এরপরেও এই 'সহজ' পরম দেহেরই অন্তর্গত। দেহের শর্তেই সাধক এই মুক্তির অবস্থায় প্রবেশ করেন। এভাবে 'সহজ'-কে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই হয় জীবনের মুক্তি।

নাথধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তন এবং এর পরিণতি হিসেবেই নাথপন্থার উদ্ভব। বৌদ্ধমত বিবর্তনের ধারায় মহাযানী বৌদ্ধমত থেকে যে সহজিয়া মতের উদ্ভব ঘটে তা ছিল চর্যাপদের রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের দার্শনিক মত। বিবর্তনের ধারায় এবং বিরুদ্ধ বাস্তবতায় বৌদ্ধমত কোনঠাসা হয়ে পড়লে সহজিয়া মত থেকে দুটি ধারার জন্ম হয়। একটি ধারা বৌদ্ধ সহজিয়াদের 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়'-এর স্থলে 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ'-কে অবলম্বন করে, যাদের সাধনা থিমুনাত্মক বা কামাচারী এবং এরাই হচ্ছে বৈষ্ণব সহজিয়া। আবার, বৌদ্ধ সহজিয়াদের থেকে আরেকটি ধারার জন্ম হয়, যারা হিন্দু সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে 'শিব' ও 'উমা'-কে আশ্রয় করে, এরাই নাথপন্থী (রায়হান রাইন, ২০১৯: ২০৭)।

বাংলার নাথপন্থীদের তত্ত্বদৃষ্টি এবং দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে নাথসিদ্ধদের জীবন ও তাদের নিয়ে রচিত সাহিত্যে। এছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম পরিস্থিতি নিয়ে সে সমস্ত গবেষণা হয়েছে তা থেকে নাথপন্থীদের তত্ত্ব-ভাবনা ও দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। নাথদের ভাবুকতার কেন্দ্রীর জায়গা জুড়ে রয়েছে যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে দেহ নিয়ন্ত্রণ এবং দেহসাধনার ভেতর দিয়ে শুদ্ধদেহ অর্জন এবং মুক্তিলাভ। অর্থাৎ নাথযোগীরা যোগসাধনার কল্যাণে কিভাবে শুদ্ধদেহ লাভ করে অমরত্বের পথ পাওয়া যায় সেটির তত্ত্ব ও পদ্ধতি বের করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং এভাবেই নাথপন্থীরা মুক্তির পথকে খুঁজেছেন। নাথদের তাত্ত্বিক কিছু জায়গা এবং সাধন-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই তাদের মুক্তি বা মো লাভের ধারণাটি কীরূপ তা স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব।

নাথযোগীদের গুরু মীমনাথ, গোর নাথ, জালন্ধর, কাহ্নপা একই সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়াদেরও গুরু হওয়ায় সাধন-পদ্ধতি হিসেবে কায়াসাধনা নাথদের কাছেও গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। নাথদের কায়াসাধনার উদ্দেশ্য জন্ম, জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি। ফলে তাদের সাধনতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে নিবৃত্তিমার্গ, দেহতত্ত্ব, শূন্যমার্গ, অদ্বৈতসিদ্ধি ইত্যাদি। নাথপন্থীদের মুক্তির ধারণা বুঝতে হলে এই প্রত্যয়গুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

নিবৃত্তিমার্গের অন্যতম ল য যোগধর্মের মাধ্যমে দেহ নিয়ন্ত্রণ ও মনকে নিবৃত্ত করা এবং এর মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর পরম্পরাকে রোধ করা। সম্যক যোগ অবলম্বন করে

চিত্তস্থৈর্যের মাধ্যমে সমাধি লাভের ভেতর দিয়ে প্রজ্ঞালাভ করতে চান নাথ সাধকগণ। এভাবেই দুঃখের কারণ অবিদ্যা দূরীভূত হয় এবং দুঃখময় সংসারের নিবৃত্তি ঘটে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মুক্তির সক্রিয় উদ্যোগ ও সংসার বৈরাগ্য। নাথদের এই নিবৃত্তিমার্গ হচ্ছে সত্যদর্শন ও দিব্যচ ু অর্জনের মাধ্যম। এতে অবিদ্যার নাশ হয় এবং এর মাধ্যমে তৃষ্ণা ও দুঃখময় জগতের উচ্ছেদ ঘটে। এই নিরোধের উপায়ই হচ্ছে 'যোগ'। চঞ্চল জলে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তাকে স্থির হতে হয়। তেমনি তরঙ্গবি ুব্ধ মনকে নিবৃত্ত করতে যোগ সাধনার প্রয়োজন (রায়হান রাইন, ২০১৯: ২১২)।

নাথপন্থীদের মুক্তি লাভের আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে 'দেহ'। নাথপন্থীরা হলেন দেহাত্মবাদী। তারা মনে করেন যে মানুষের যত দুঃখ-শোক তার কারণ হচ্ছে মানবদেহ। যোগ হচ্ছে এমন এক আগুন যা দিয়ে অপক্ক দেহকে সিদ্ধ করা যায়। কাজেই নাথদের যোগ অবম্বনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে সিদ্ধ দেহ অর্জন। ক্রমপরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয় এই সিদ্ধ দেহ। একজন সাধক তার সাধনার পথে প্রথমে 'সিদ্ধতনু' অর্জন করেন। তা থেকে ক্রমিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অর্জিত হবে 'দিব্যতনু' এবং অতঃপর তা থেকে অর্জিত হয় 'প্রণবতনু'। যিনি কায়াসাধনার মাধ্যমে প্রণবতনু অর্জন করেন তিনিই হন মৃত্যুঞ্জয়। নাথপন্থীরা দেহসিদ্ধির ভেতর দিয়ে অমরত্ব বা শিবত্ব লাভ সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন। এই অমরত্ব লাভই নাথদের সাধনার উদ্দেশ্য (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ৫৩১)। এ বিষয়ে নাথপন্থীদের তত্ত্ব হলো: "দেহভাণ্ড স্থিত অমৃতের র ণ, তার ভক্ষণ, তার সাহায্যে সমগ্র দেহের আপ্যায়ন ও ক্রমপরিবর্তন" (রায়হান রাইন, ২০১৯: ২১২)। যোগসাধনা দ্বারা সিদ্ধদেহ অর্জন প্রসঙ্গে গোর নাথ রচিত গ্রন্থ *যোগবীজ*-এ বলা হয়েছে:

> "চিত্তং প্রাণেণ সংবদ্ধং সর্বজীবেষু সংস্থিতম্।
> রাজা যদ্বৎ পরিবদ্ধঃ পক্ষী যদ্বদিদং মনঃ ।।
> নানাবিধৈর্বিচার্য্যস্ত ন সাধ্যং জায়তে মনঃ
> তস্থাত্তস্য জায়োপায়ঃ প্রাণ এবং হি নান্যথা।।
> তর্কৈর্জল্পৈশ্ শাস্ত্র জালৈর্যক্তিভিষজ্ঞ ভৈষজৈঃ
> না বশো জায়তে প্রানঃ সিদ্ধপায়ং বিনা প্রিয়ে
> উপায়ং তমবিজ্ঞায় যোগমার্গ প্রবর্ততে।"
> (ভোলানাথ নাথ, ১৯৮০: ১১৮)

অর্থাৎ দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা পাখির মতো সমস্ত জীবের মন বাঁধা আছে প্রাণবায়ু দ্বারা, নানা রকম বিচার দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায় না, সুতরাং প্রাণই মন জয়ের একমাত্র উপায়। তর্ক, জল্প, শাস্ত্র, জাল, যুক্তি, যজ্ঞ, ভেষজ-এগুলোর কোনটিই দ্বারা মনকে বশে আনা সম্ভব নয়, তাই অন্য কোন উপায় জানা না থাকায় প্রবর্তিত হয়েছে যোগমার্গ।

যোগ মনকে স্থির করে এবং এর ফলে সত্যকে প্রতিফলিত হতে দেয়। এ কারণে যোগকে শাস্ত্রকারগণ বলেন- 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ' (ভোলানাথ: ১১৮)।

নাথদের মুক্তির ধারণায় যোগ সাধনার সাথে আরেকটি বিষয় জড়িত তা হলো বায়ু সাধনা। হঠযোগে বায়ুর সাধনা করা হয়। শরীরে বায়ুর সঞ্চালন ও বায়ুর ধারণই হঠযোগ। স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র রচিত *হঠপ্রদীপিকা* গ্রন্থে এ বিষয়ে গোর   নাথের একটি বাক্যকে উদ্ধৃত করা হয়েছে-

"মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির
বিন্দু থির তো কন্দ থির
বলে গোরখদের সকল থির।"
(আহমদ শরীফ, ২০০৯: ২৪৪)

গোর   নাথের উদ্ধৃত এই বাক্যে বলা হচ্ছে, মনকে স্থির করার মাধ্যমে বায়ুকে স্থির করা যায়। বায়ু যখন স্থির হয়ে তখন বিন্দু স্থির হয়। বিন্দু স্থির হলে কন্দও স্থির হয়। এভাবে সবকিছু স্থৈর্য্য লাভ করে।

নাথযোগীরা রতিনিরোধ তথা বামাচারবর্জিত সাধনা করেন। তাদের সাধনার একটি অঙ্গ হলো 'বিন্দুধারণ'। সাধনার লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অর্থাৎ অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে হলে রতিনিরোধ করতে হবে। নাথযোগীরা বিশ্বাস করে যে, স্ত্রী সঙ্গ করলে বিন্দু   য় হয় এবং বিন্দু   য়ের ফলে আয়ু ও বল নাশ হয়। বিন্দুধারণ নাথসাধকের মুক্তির জন্য তথা মোক্ষলাভের জন্য একটি জরুরি শর্ত। নাথযোগীদের কাম তথা রতি-নিরোধ করতে হয়। রতি-নিরোধ মানে যৌনতাকে জয় করা এবং এর নামই হলো বিন্দুধারণ।

নাথপন্থীদের মুক্তির ধারণা আলোচনায় দেখা যায় নাথপন্থী সম্প্রদায় বৌদ্ধ সহজিয়াদের থেকে উদ্ভূত হলেও উভয় সম্প্রদায়ের সাধন ধারার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ শূন্যতার জ্ঞান ও করুণা অবলম্বনের মাধ্যমে 'সহজ'-কে পেতে চান। এই 'সহজ' এমন এক মানসিক অবস্থা যে অবস্থায় পৌঁছালে সাধকের কাছে সমস্ত দ্বৈততার জ্ঞান লোপ পায় এবং সাধক এক সাম্যাবস্থায় উপনীত হন। কিন্তু নাথদের লক্ষ্য অমরত্ব লাভ, দেহকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করা। নাথপন্থীরা মো   লাভ করতে চেয়েছেন অমরত্ব, অজরত্ব এবং অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের ভেতর দিয়ে এবং এই লক্ষ্যে যোগ সাধনাকে তারা সবসময় মাধ্যম হিসেবে নিয়েছেন।

বাংলার সূফীবাদ

মরমীবাদ মুসলিম দর্শনে সূফীবাদ (আত্তাসাউফ) নামে খ্যাত। বাংলা অঞ্চলকে মরমীবাদের চারণভূমি বলা চলে। আধ্যাত্মিক বিষয় এ অঞ্চলে অনেক আগে থেকেই চলে এসেছে। বাংলা অঞ্চলে তেরো শতকে ইসলামি মরমীবাদ বা সূফীবাদের সূত্রপাত ঘটে। বাংলা অঞ্চলে দুই ধরনের ইসলামের আগমন ঘটে। এক হচ্ছে, শাসক ইসলাম এবং দুই, সাধক শ্রেণির ইসলাম। এই সাধক শ্রেণির মানুষরাই এ অঞ্চলে সূফীবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা অঞ্চলে ইসলামি মূল সূফীমত এসে তা এ অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তা, ধ্যান-ধারণার সাথে মিশে এক নতুন রূপ ধারণ করে। পনেরো শতাব্দীর পর থেকে বাংলার সূফীবাদ বাংলার বিভিন্ন নিজস্ব ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এতে করে এক অর্থে এসব দ্বারা সূফীবাদের উন্নতি সাধিত হয় এবং অন্য অর্থে বিকৃত ও অনৈসলামিক প্রভাবে প্রভাবিত হয় (মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, ১৯৯৪: ৫০)। যে অদ্বৈতভাবকে আশ্রয় করে প্রাচীন যোগ, তন্ত্র, বৌদ্ধ সহজিয়া ইত্যাদি ধর্মধারা বাংলা অঞ্চলের মানুষের মনে ও কর্মে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, সেই বিশ্বাসের সাথে যুক্ত হয়ে সূফীমতও নতুন এক রূপ ধারণ করে এবং এই মত সাধারণ জনগণের মাঝে সমাদৃত হয়। এই নতুন আকারপ্রাপ্ত সূফীবাদের নামই বাংলায় 'নব্য সূফীবাদ' নামে পরিচিত। বাংলায় যে লৌকিক ইসলাম বা নব্য সূফীবাদের উদ্ভব ঘটেছে সেখানে যুক্ত হয়েছে কায়াসাধনা বা দেহতত্ত্বের ধারণা। আবার দেহতত্ত্বের ধারণায় যুক্ত হয়েছে মোকাম-মঞ্জিল, হাল, চতুর্কায়, জ্যোতি (লতিফা), লাহুত-হাহুত, মুরাক্বিবাহ্, ফানাফিশেখ, ফানাফিলাহ, বাক্বাবিলাহ ইত্যাদি ধারণা।

সূফী দর্শনের মূল কথা হচ্ছে 'আল্লাহ', যিনি একমাত্র পরম সত্তা। জগতের যাবতীয় বস্তু 'আল্লাহ' থেকে নিঃসৃত হয়েছে। ইসলামি মত হলো দ্বৈতবাদী অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার সত্তায় পৃথক। আর সূফীরা হলেন অদ্বৈতবাদী অর্থাৎ তাদের মতে আত্মা পারমাত্মারই খণ্ডাংশ। পরমকে পাওয়ার জন্য সূফীগণ কিছু মূলনীতি গ্রহণ করেন। এগুলো হলো তওবা, তাওয়াক্কুল, পরিবর্জন, সবর, আত্মসমর্পণ, এখলাস, ইশকে আল্লাহ, জিকর, শোকর, কাশফ, সঙ্গীত, ফানাফিলাহ, বাক্বাবিলাহ প্রভৃতি। সূফী সাধনার পূর্ণতা ঘটে 'ফানাফিলাহ'-এর মাধ্যমে 'বাক্বাবিলাহ'-তে উপনীত হবার মাধ্যমে। 'ফানা' ও 'বাক্বা' সূফী সাধনার সর্বোচ্চ স্তর। 'ফানা' মানে আত্মবিনাশ, এই স্তরে সূফী সাধক প্রবৃত্তি ও কামনার মায়াজাল ছিন্ন করে ঐশী সত্তায় উপনীত হন। পরম আল্লাহকে লাভ করার সর্বশেষ স্তর হলো 'বাক্বা'। 'বাক্বা' মানে ঐশী সত্তার স্থায়ীত্ব লাভ করা। এ স্তরে সূফী সাধক আল্লাহর চিরন্তন সত্তায় অবস্থান করেন। এভাবে সূফী সাধকগণ তাদের জীবনে মুক্তিলাভের পথ তৈরী করেছেন। বাংলা অঞ্চলের সূফী সাধকদের মুক্তি লাভের পন্থাও সেরূপ অর্থাৎ পরম সত্তা আল্লাহকে খোঁজা এবং পরমের সাথে নিজের সত্তাকে একাকার করে ফেলা।

মূল সূফীবাদের সাথে বাংলা অঞ্চলের সূফীবাদের কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন বাংলার সূফীবাদে পরমের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অহংবিলোপের বা 'ফানাফিলাহ'-এর ধারণা বৌদ্ধ 'নির্বাণ'-এর ধারণা থেকেই এসেছে (Edward Paul, 1967: 41)। তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে, এই নির্বাণের অর্থ ইন্দ্রিয়-নিরোধের মাধ্যমে বা দৈহিক প্রক্রিয়ায় দ্বৈতাভাস মুক্ত হয়ে শূন্যাবস্থায় উপনীত হওয়া। বাংলার নব্য সূফীবাদে বৌদ্ধ চতুর্কায়ের মতো তন লতিফু, তন কসিফু, তন ফানি ও তন বাকিউ ধারণা পরিকল্পিত হয়েছে। তন্ত্রের ষড়পদ্মের আলোকে কল্পিত হয়েছে ষড়-লতিফা। হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের শরীরী চক্র সূফীতত্ত্বে 'মোকাম-মঞ্জিল' তত্ত্বে রূপান্তর লাভ করেছেন (আহমদ শরীফ, ২০০৯: ২৩৭-২৩৮)।

মধ্যযুগে বাংলার সূফীদের মাঝে শেখ জাহিদ, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, শেখ জেবু, আবদুল হাকীম, শেখ চাঁদ, রমজান আলী, রহিমুদ্দীন মুন্সী প্রমুখদের যোগ পদ্ধতি ও যোগ দর্শনের সমন্বয়ে সূফী সাহিত্য সৃষ্টি করতে দেখা যায়। বাংলার যোগ-তন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত অনেক সূফীগ্রস্থই রচিত হয়েছে। যেমন- ষোল শতকে ফয়জুল্লাহর *গোর বিজয়*, সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞানপ্রদীপ*, হাজী মুহম্মদের *সুরতনামা* বা *নূরজামাল*, শেখ জাহিদের *আদ্য পরিচয়*, মহসিন আলীর *মোকাম-মঞ্জিল কথা*, শেখ মনসুরের *সির্নামা*, রমজান আলীর *আদ্যব্যক্ত* প্রভৃতি রচিত হয়। এসব গ্রন্থে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেহতত্ত্ব, সূফীর ফানা-বাক্বা, বৌদ্ধ শূন্য-নির্বাণ এবং বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্ব প্রভৃতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রত্যয়গুলো বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ইত্যাদি হচ্ছে এসব গ্রন্থের মূল আলোচনার বিষয়। এসব গ্রন্থে ইসলামি ও বৌদ্ধব্রাহ্মণ্য তত্ত্বচিন্তার ও সাধনতত্ত্বের অসঙ্গত ও অসামঞ্জস্য মিশ্রণও প্রকট (ড. আহমদ শরীফ, ১৯৮০: ১৭৯)।

বাংলার সূফীবাদী তত্ত্ব অনুসারে মুক্তি লাভের ে ত্রে পরম সত্তা আল্লাহর সাথে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে ফেলার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যোগ সাধনা। আবার যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ধ্যান, যার মাধ্যমে শরীর-মন নিয়ন্ত্রিয় হয়। এই ধ্যানী ব্যক্তিকে জাগতিক মোহ, লোভ বা কাম-ক্রোধ বশীভূত করতে পারে না। এভাবে যোগ সাধনা দ্বারা পরম সত্তা আল্লাহর সাথে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে ফেলা যায়। এই পরম সত্তা আল্লাহকে বৌদ্ধ 'শূন্য'-এর সাথে অভিন্ন করে দেখেছেন কোন কোন সূফী। যেমন- সৈয়দ সুলতান তাঁর *জ্ঞানপ্রদীপ* গ্রন্থে বলেন:

"দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
সে শূন্যের সাথে করে ফকির পিরীতি।"
(*জ্ঞানপ্রদীপ*- সৈয়দ সুলতান)

অর্থাৎ পরম সত্তা আল্লাহকে শূন্যের সাথে তুলনা করছেন সৈয়দ সুলতান।

নব্য সূফীদের মুক্তির ধারণা তথা পরমকে অর্জন করার বিষয়টির সাথে আরেকটি ধারণা গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হচ্ছে 'আত্মতত্ত্ব'। বাংলার নব্য সূফীরা তাদের সূফীকাব্যে আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিরোনামে করেছেন। যেমন- 'আত্মতত্ত্ব', 'আরোহতত্ত্ব', 'মনতত্ত্ব', 'চন্দ্রতত্ত্ব' ইত্যাদি। আত্মজ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানের সোপান। এখানে বলা হচ্ছে †য, আত্মতত্ত্ব যে জানে সে পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করে। তাই পরমকে জানতে হলে তথা পরমকে পেতে হলে আত্মার জ্ঞান জানা খুব জরুরী। তবে মূল ইসলামি সূফীবাদ কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। নব্য সূফীবাদে আলাদা কিছু চিন্তাধারা ল করা যায়। যেমন বাংলার সূফীবাদে আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে এমন সব উক্তি এখানে করা হয়েছে যার সাথে বৌদ্ধনৈরাত্মবাদ, চার্বাক মতবাদ, আল ফারাবি, ইবনে সিনা প্রমুখ মুসলিম দার্শনিকদের মতবাদ ও পারস্যের সূফী দার্শনিক মনসুর হাল্লাজ, বায়েজিদ বোস্তামি, রুমী, আল গাজ্জালি প্রমুখ সূফী দার্শনিকদের মতবাদের সাথে মিল পাওয়া যায়। এসব ধারণার সাথে আবার কোরআনে উল্লেখিত 'রূহ' বা আত্মা সম্পর্কিত মতবাদের সমন্বয় সাধন করে আত্মা সম্পর্কে এক মিশ্র দর্শন সৃষ্টি করা হয়েছে।

নব্য সূফীবাদের মতে পরমকে পাবার একটি উপায় হলো চঞ্চল মনকে নিশ্চল করে সেই স্থিতির ভেতর আচেনাকে ধরা। যোগলব্ধ মনের স্থির নিশ্চলতার ভেতর মূর্ত হয়ে উঠবে অচিন নিরাকার। মন যখন ইন্দ্রিয়ের আলোড়নে চঞ্চল থাকে তখন তাতে পরমের ছায়া পড়তে পারে না। যোগের মাধ্যমে মনকে স্থির করা গেলে সেখানে পরমের চিহ্ন ধরা পড়বে, যেভাবে তরঙ্গ-সঙ্কুল জলে মুখ দেখা যায় না কিন্তু জল স্থির হলে তাতে ফুটে ওঠে মুখাবয়ব। সৈয়দ সুলতানের ভাষায়-

> "ছায়াত কায়ার যথ আছে পরিচিন
> ছায়া যেই কায়া সেই নাহি ভিন্ন ভিন ।"
> (জ্ঞানচৌতিশা- সৈয়দ সুলতান)

অর্থাৎ ছায়াতে যেমন দেহের পরিচিহ্ন থাকে, তেমনি কায়াতে থাকে ছায়ার পরিচিহ্ন। উভয়ের মধ্যে আপাত কোন পার্থক্য নেই। একটি পর্যায়ে ছায়া ও কায়ার ভেদ ঘুচে যায়। যোগের মাধ্যমে মন নিশ্চল করে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার পর রূপ এবং স্বরূপের মাঝে আর কোন পার্থক্য থাকে না।

বাংলার সূফী কবিগণ মনে করেন পরমতত্ত্ব আত্মারূপে বিরাজ করে দেহে। যেমন- সৈয়দ সুলতান বলেছেন :

> "এ তেল বারিত যেন বৈসে হুতাশন
> তনুমধ্যে তেন মতো আছে নিরঞ্জন ।
> তনু মধ্যে সহস্র দলেত বৈসে নিত

তার দীপ্তি পড়এ যে শরীর বিদিত।"
(জ্ঞানচৌতিশা- সৈয়দ সুলতান)

সৈয়দ সুলতান এখানে একটি উপমা ব্যবহার করে নিরঞ্জন পরম তত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন, তেলের ভেতর যেমন আগুন নিহিতি থাকে, তেমনি দেহের মাঝে নিহিত আছে নিরঞ্জন। যোগ সাধনা দ্বারা দেহের মাঝে এই পরমকে উপলব্ধি করা যায়।

নব্য সূফীবাদের তাত্ত্বিক অংশগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে বাংলার সূফীসাধকগণ বা নব্য সূফীগণ তাদের মুক্তির পথ খুঁজেছেন মূলত আল্লাহকে বা পরমকে খোঁজার মাধ্যমে। তাদের মুক্তির ল ্য হচ্ছে পরমকে অর্জনের ল ্য। আরবের সূফীবাদে দেহাত্মবাদী কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু বাংলার নব্য সূফীবাদে বাংলা অঞ্চলের দেহাত্মবাদী ধারণার সংমিশ্রণ ঘটে। নব্য সূফীবাদের মতে পরম দেহের মাঝেই অবস্থান করে, এই ধারণাটি আরবের সূফীবাদী ধারণা থেকে ভিন্ন। নব্য সূফীদের মতানুসারে দেহের মাঝে পরমকে খোঁজা এবং এই পরমের সাথে নিজেকে একীভূত করাই তাদের জীবনের ল ্য এবং এভাবেই হবে জীবনের মুক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

নব্য সূফীবাদের পরে বাংলায় যে নতুন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে তার নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। বিষ্ণুর উপাসকদের বৈষ্ণব বলা হয়। বৈষ্ণব দর্শনের কিছু শ্রেণিবিভাগ পাওয়া যায়, যেমনঃ শ্রৌত বৈষ্ণব, পৌরানিক বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রবর্তন করেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত এবং গদাধর পণ্ডিত। এছাড়াও তাঁর ছয়জন শিষ্য ছিলেন যারা ষড়গোস্বামী নামে খ্যাত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গেলে এক কথার বলা যায়- ষড় গোস্বামীর একজন শ্রীজীব গোস্বামী রচিত *ষট্সন্দর্ভ* গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবন, কর্ম, বাণী এবং সর্বোপরী তাঁর আদর্শকে ধারণ করে যে দর্শন গড়ে ওঠে তাই বাংলার দর্শনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নামে পরিচিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মুক্তির ধারণায় একটি নতুনত্ব পাওয়া যায় এবং সেটি হচ্ছে 'ভক্তি'। ভক্তি আন্দোলন বা ভক্তি দিয়ে পরমকে উপলব্ধি বাংলার অন্য কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ে আগে ছিল না। তাদের ভক্তি হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা ভক্তির মাধ্যমে পরম কৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে চান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মুক্তির ধারণা বুঝতে গেলে এই ভক্তিবাদকে বুঝতে হবে।

বেদান্তসূত্রে শংকরাচার্যের ভাষ্য অনুযায়ী ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য এবং জীব ও জগৎ হলো মিথ্যা প্রতিভাস। শংকরাচার্যের এরুপ জ্ঞানমার্গীয় ব্যাখ্যার বিপরীতে বৈষ্ণবগণ জীবসত্তা ও পরম সত্তার সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, জীব

ও জগতের সঙ্গে পরম সত্তার সম্পর্ক যুগপৎ ভেদ ও অভেদের। এই ভেদাভেদ সম্পর্ক অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর বলেই এই তত্ত্বকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব' বলা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে একমাত্র 'ভক্তি' দ্বারাই কৃষ্ণকে বশ করা যায়। শ্রীচৈতন্যের মতে-

"ঐছে শাস্ত্রে কহে ধর্ম জ্ঞানযোগ ত্যাজি
ভক্তে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্তে তাঁরে ভজি।।"
(চৈ.চ. মধ্যলীলা : বিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩০৫)

অর্থাৎ কর্ম বা জ্ঞান নয় বরং ভক্তি দ্বারাই কৃষ্ণকে বশ করা যায়। পরমাত্মা কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক যে জ্ঞান দ্বারা অনাবৃত তা চৈতন্যের এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বৈষ্ণবদের মুক্তি বা মো লাভ হচ্ছে একমাত্র ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা এবং কৃষ্ণকে বশ করা। এক্ষেত্রে বৈষ্ণবরা মাধ্যম হিসেবে নিয়েছেন ভক্তিমার্গকে।

বাংলা অঞ্চলের দর্শনের ইতিহাসে মুক্তির পথ বা উপায় মূলত তিন ধরনের। এদের একটি হলো জ্ঞানমার্গ - যেটির অনুসারী ছিলেন শংকরাচার্য। আবার আরেকটি মুক্তির পথ বা উপায় হলো কর্মমার্গ - যেটি ব্যবহার করে বেশিরভাগ মানুষই মুক্তির পথ খুঁজেছে। সর্বশেষ যে মুক্তির ধারণা বা পথ রয়েছে তা হচ্ছে ভক্তিবাদ - যেটির অনুসারী ছিলেন বৈষ্ণবরা। ভক্তিবাদ হলো পরম কৃষ্ণের সাথে প্রেম বা ভক্তির সম্পর্ক। শ্রীচৈতন্যের ভাষায় কর্ম, জ্ঞান ও যোগের পথ পরিত্যাগ করে আমাদের একমাত্র ভক্তির পথ আশ্রয় করা উচিত, কারণ পরম সত্তা কৃষ্ণ একমাত্র ভক্তি দ্বারা বশীভূত হন। বৈষ্ণবরা মুক্তির প্রসঙ্গে বা পরমকে উপলব্ধি করার প্রসঙ্গে জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ উভয় পন্থার সমালোচনা করেন। কর্ম ও জ্ঞানের মাধ্যমে যে কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় তা সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দেবার সময়ে শ্রীচৈতন্য উল্লেখ করেন:

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কর।।"
(চৈ.চ. মধ্যলীলা : ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৯৫)

অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা যায় না, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই সেটা সম্ভব। বৈষ্ণবরা জ্ঞানমার্গের সমালোচনায় বলেন, জ্ঞানমার্গ দিয়ে যেমন পরমকে জানা সম্ভব নয় তেমনি মুক্তি লাভ করাও সম্ভব নয়। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*-তে শ্রীচৈতন্যের সাথে রায় রামানন্দের সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনাকালে জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদের মতে মানুষের সীমিত জ্ঞান দ্বারা জগৎ তথা পরমকে জানা যায় না।

কর্মমার্গের সমালোচনায় বৈষ্ণবরা বলেন, কর্মের মধ্যেও মানুষের মুক্তি নাই। অভাব থেকেই কর্মের জন্ম হয়। 'অভাব' মানে হলো যেখানে ভাব নাই। বৈষ্ণবদের দাবি হলো ভাব না থাকলে ভক্তি আসবে কিভাবে? আবার জ্ঞানমিশ্রিত কর্ম এবং কর্মমিশ্রিত জ্ঞান দ্বারাও মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে মুক্তি পাওয়া যাবে কিভাবে? বৈষ্ণবরা বলেন, মুক্তি আসবে কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে এবং কৃষ্ণ বা পরমকে উপলব্ধির ে ত্রে এই ভক্তি হবে 'অহেতুক ভক্তি'। অর্থাৎ যে ভক্তির কোন হেতু নাই, কোন উদ্দেশ্য বা ফলাফল নাই। অতএব দেখা যাচ্ছে ৈবষ্ণবরা মুক্তির পথ আলোচনায় যেমন ভক্তিবাদের প্রচলন করেছেন, সেই সাথে ভক্তির এক নতুন স্বরূপ নিয়ে এসেছেন। এ ভক্তি হচ্ছে অহৈতুকী বা কারণ ব্যাতীত ভক্তি। এই ভক্তি হবে শুদ্ধ ভক্তি। অনেকটা Art for art's sake বা কলাকৈবল্যবাদের মত। কলার যেমন কোন উদ্দেশ্য থাকে না তেমনি ভক্তিরও কোন উদ্দেশ্যে থাকবে না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তির সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা কঠিন, কারণ তা ভক্তের মরমীচেতনার সাথে যুক্ত এবং যুক্তি বা জ্ঞানবিচারের মাধ্যমে এর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীচৈতন্য তাই শিক্ষাষ্টকে এই ভক্তিকে বলেছেন 'অহৈতুকী ভক্তি'। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকে উল্লেখিত শ্লোকে বলা হয়েছে-

> "ন ধনং জনং ন সুন্দরীং
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

শ্লোকার্থঃ

> ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী
> শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি।।
> (চৈ.চ. অন্ত্যলীলা: বিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫০৭)

অর্থাৎ অহেতুক ভক্তির মাধ্যমে পরম সত্তার কৃপা লাভ সম্ভব ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ তথা ভক্তির স্বরূপ আলোচনায় দেখা যায় যে শংকরাচার্জের জ্ঞানমার্গীয় অদ্বৈতবাদের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে যে দ্বৈতবাদী ভক্তিবাদের প্রচলন গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা করেছিলেন তা বাংলা অঞ্চলের দর্শনে মোক্ষ লাভের ধারণায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। বৈষ্ণবদের আগে যেসকল দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল (যেমন- তন্ত্র, সহজিয়া বৌদ্ধমত, নব্য সূফীবাদ প্রভৃতি) তাদের মুক্তির ক্ষেত্রে যে মাধ্যমগুলো ছিল যেমন- যোগ, কর্ম, জ্ঞান ইত্যাদি মাধ্যমগুলো বৈষ্ণবরা বর্জন করেন। যোগ তত্ত্বানুসারে ব্যক্তির আত্মা পরম আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। অর্থাৎ পরম সত্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ঐক্যের লক্ষ্যে যে কায়াসাধনা তাই হলো যোগসাধনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পরম সত্তায় মিশে যাবার তত্ত্বটিকে বর্জন করেন। কারণ তারা স্বয়ং পরম সত্তা

বা পরম সত্তার অংশ হতে চান না। পরম কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিকে বৈষ্ণবরা মো র চেয়ে বড় মনে করেন এবং এই ভক্তি হলো অহেতুক ভক্তি যার কোন ফলাফল নেই। সূফীদের সাথে বৈষ্ণবদের মুক্তির ধারণার পার্থক্য এখানেই। সূফীরা পরম সত্তার সাথে মিশে যেতে চান। সূফী মতানুসারে আত্মা পরমাত্মারই খণ্ডাংশ এবং সূফী সাধকদের সাধনার লক্ষ্য ছিল পরমের সাথে নিজ আত্মাকে একত্রিত করা অর্থাৎ সূফীদের সাধনার একটি উদ্দেশ্য বা ল য ছিল। কিন্তু বৈষ্ণবাদের ভক্তিবাদে ভক্তি হলো অহেতুক ভক্তি। বৈষ্ণবদের পরমকে পাওয়ার জন্য যে ভক্তি সেখানে কোন হেতু নেই বা ফলাফল নেই।

বাউল দর্শন

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ভেঙ্গে পরবর্তীতে বৃহত্তর নদীয়া এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলে কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামী, কিশোরী ভজন, সাঁইভজা প্রভৃতি নামে অসখ্য ছোট ছোট ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বৈষ্ণব পরবর্তীকালে এই ধারায় বাউল মতেরও উদ্ভব। বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তীতে সহজিয়া বৌদ্ধ মতের সাথে মিলে 'বৈষ্ণব সহজিয়া' নামে উদ্ভূত হয়। এরাই পরবর্তীতে বাউল রূপে রূপান্তরিত হয়। বাংলার বাউল সম্প্রদায় তাদের পূর্ববর্তী সকল সম্প্রদায়ের চিন্তা, চেতনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদিকে একত্রিত করে নতুন এক সমন্বয়ী দর্শন তৈরী করেছে বলা চলে। তাই বাউলদের মুক্তির ধারণায় পূর্ববর্তী সকল সম্প্রদায়গুলোর ধারণার ও সাধন-পদ্ধতির সমন্বয় দেখা যায়। বাউলরা হলেন দেহাত্মবাদী। বাউল সাধকগণ দেহের মাঝেই পরমকে খুঁজেছেন। বাউল সাধকগণ বিশ্বাস করেন যে মানবদেহের মাঝেই পরমসত্তা বা ঈশ্বর বাস করে। দেহের বাহিরে পরমের কোন অস্তিত্ব নেই। তাই বাউল সাধকগণের লক্ষ্য হচ্ছে †দহ সাধনার মাধ্যমে এই পরমকে উপলব্ধি করা। এভাবেই বাউল সাধকগণ জীবনের মুক্তি বা মো লাভের পথ তৈরী করেছেন। বাউলরা হলেন ভাবগায়ক, বাউলদের দেহসাধনার ক্ষেত্রে মানুষকে সর্বদা কেন্দ্রীয়ভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। মানুষই তাদের দর্শনের ল য। মানবদেহই হচ্ছে তাদের কাছে আত্মোপলব্ধি তথা মুক্তি লাভের সোপান।

বাউলদের দেহাত্মবাদী মত অনুযায়ী দেহ নিরপেক্ষ আত্মার অস্তিত্ব নেই। বাউল সাধকগণ বিশ্বাস করেন, আত্মা দেহ নির্ভর এবং তা পরমাত্মার সাথে অভিন্ন। আত্মাকে জানলে পরমাত্মাকেই জানা যায়। বাউলগণ দেহাত্মবাদের উত্তরাধিকার নিয়েছেন তন্ত্র সাধনা থেকে। দেহস্থিত আত্মাকে বাউলগণ দেখেছেন এক প্রকার ভাবসত্য হিসেবে যাকে তারা 'সহজ মানুষ', 'মনের মানুষ', 'মানুষ রতন', 'অধর মানুষ', 'আলেক সাঁই' ইত্যাদি নাম দ্বারা অভিহিত করেন। এই 'সহজ স্বরুপ' বা নিরাকার পরম আকার (দেহ) ছাড়া অস্তিত্বহীন। বাউলগণ এই সাকার দেহের ভেতর 'অল য মানুষ'-কে অন্বেষণ করেন এবং এই ভাবসত্যকে করণ-সম্পর্ক দিয়ে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে চান। এই রূপের ভেতর স্বরুপের সাধনা এবং এই হলো তাদের আত্মতত্ত্ব (রায়হান রাইন, ২০১৯: ২৯২)।

মানুষের মাঝে পরম কিভাবে আছে? এর উত্তরে বাউল সাধকরা বলেন, পরম বিমূর্ত ও নিরাকার, অর্থাৎ আমাদের চেতনায় এর আকার নাই। মানুষের ভেতরই পরম আছে কিন্তু আমরা তা জানি না। এটাকে জানার সাধনাই হলো বাউলদের সাধনা। বাউলগণ মানবদেহে যে মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন তাকে কেবল 'আত্মা' কথাটি দ্বারা উপস্থাপন করা যায় না। লালন মানবদেহেকে কেবল আত্মারূপে নিরুপণের চেষ্টা করে গান গেয়েছেন-

"কর্তারূপে নাই অন্বেষণ
আত্মারে কি হয় নিরুপন
আত্মতত্ত্বে পায় শতধন
সহজ সাধক জনে।
আপনারে আপনি চিনিনে।"
(আবদেল মাননান, ২০১৩: ৬৮৬)

অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অন্বেষণে আত্মাকে নিরুপনের জন্য মানবের কর্তারূপটির বিচারও প্রয়োজন। প্রত্যেক দেহে একটা জৈবরূপ আছে (আত্মারুপ) এবং এর পাশাপাশি আছে কর্তারূপ। আত্মারূপ সবারই এক কিন্তু কর্তারূপ সবার এক নয়, আলাদা। কিন্তু ভাবসত্তাকে সক্রিয় করতে লাগবে কর্তারূপ (রায়হান রাইন, ২০১৯: ২৯৪)।

দেহস্থিত আত্মাকে বাউলগণ দেখেছেন এক প্রকারের ভাবসত্য হিসেবে যাকে তারা 'সহজ মানুষ', 'মানুষ রতন', 'অরুপ রতন', 'অধর কালো', 'মানের মানুষ' ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করেন। বাউলরা অসীম পরমকে উপলব্ধি করতে চান জ্ঞানের মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে এবং সাধনার মাধ্যমে। সহজ মানুষকে ভজনা করতে পারলেই অর্থাৎ মানুষের ভেতরের অনন্ত পরমকে ভজনা করতে পারলেই বর্তমানের জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। লালনের একটি গানে বলা হয়-

"সহজ মানুষ ভজে দেখনারে মন দিব্যজ্ঞানে
পাবিরে অমূল্য নিধি বর্তমানে।"
(আবদেল: ৬৪৬)

অর্থাৎ মানুষকে ভজনা করলে বর্তমানেই পরমকে পাওয়া সম্ভব। আবার আরেকটি গান এরূপ-

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।"
(আবদেল: ৬২২)

অর্থাৎ মানুষ ভজনাতেই পরমের সন্ধান মেলে। এরকম অজস্র বাউল গানে বাউল সাধকগণ কখনও সরাসরি আবার কখনও রূপকী অর্থে মানুষ তথা মানবদেহ ভজনা

করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। দেহের বাহিরে আত্মা বা পরমাত্মা বলে কোন সত্তাকে বাউল মত স্বীকার করে না।

বাউলদের দেহসাধনা তথা পরমকে উপলব্ধি করার বিষয়টির সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদান জড়িত তা হলো 'রূপ-স্বরূপতত্ত্ব'। রূপ হচ্ছে বাহিরে থাকে যার আকার নাই এবং যাকে দেখা যায় না। এই রূপাশ্রিত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে সত্তার বসবাস সেটাই হচ্ছে স্বরূপ। বাউলদের সাধনার মূল উদ্দেশ্য হলো রূপ থেকে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া। রূপ-স্বরূপতত্ত্বের মূল কথা হলো - ভাবসত্তাকে বস্তু সত্তায় পরিণত করা এবং ভেতরের অংশকে বাহিরে নিয়ে আসা। রূপ হচ্ছে বাহ্যিক এবং স্বরূপ হচ্ছে অন্তর্নিহিত। বর্তমানে আধুনিক দর্শন স্বরূপকে গুরুত্ব দেয় বেশি এবং রূপকে বিচার করে কম। অর্থাৎ ভেতরের সত্যকে বেশি গুরুত্ব দেয় হয়। এ কারণে আধুনিকতাবাদের প্রতিপাদ্য (slogan) হচ্ছে "Not the surface, but the deep"। আবার উত্তর আধুনিকতাবাদ বলে বিপরীত, তারা স্বরূপকে গুরুত্ব না দিয়ে রূপকে বেশি গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ বাহ্যিক অংশকে প্রাধান্য দেয় বেশি। যাই হোক, বাউল রূপ-স্বরূপতত্ত্বের মূল কথা হলো "তোমার অন্তর্নিহিত রূপকে খোঁজো এবং তাকে বাহিরে নিয়ে আসো"। অর্থাৎ বাউল দর্শন অনুযায়ী স্বরূপকে রূপে নিয়ে আনতে বলা হচ্ছে। কর্মের মাধ্যমে রূপ ও স্বরূপের সমন্বয় দ্বারা এভাবেই মুক্তি লাভ হবে।

বাউলদের দেহাত্মবাদী ধারণা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা যে ল ্যকে সামনে নিয়ে তাদের সাধন-পদ্ধতি পরিচালনা করেছেন সেটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ। মানবদেহের মধ্যে পরমকে উপলব্ধির মাঝেই তাদের মুক্তি বা মো লাভ। মানুষের ভেতর বাস করে অনন্তরূপ পরম। এই পরমকে ভজনা করাই তাদের মুক্তির সোপান। তাদের এই দর্শন প্রতিষ্ঠায় তারা কখনো প্রচলিত ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছেন। দেহসাধনার মাধ্যমে পরমকে উপলব্ধি তথা মোক্ষ লাভের এ ধারণা বাউলরা পূর্বের দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো থেকে গ্রহণ করলেও বাউলদের দেহ সাধন-পদ্ধতি ছিল পুরোপুরি মানুষ কেন্দ্রিক। বাউলরা দেহভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা সর্বশেষে মানুষকেই নিয়ে এসেছেন অন্বেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। নব্য সূফীগণ পরমকে দেহের মাঝে খুঁজেছেন। তবে নব্য সূফীবাদীদের সাথে বাউলদের মুক্তির পার্থক্য হলো, সূফীরা কেবল নির্জনে ধ্যান ও যোগসাধনার মাধ্যমে পরমসত্তা আল্লাহর সাথে নিজ সত্তাকে একীভূত করতে চেয়েছেন। তবে বাউল সাধকগণ সমাজের সকলকে নিয়ে মো লাভের পথ খুঁজেছেন। তাই তাদের চিন্তায় মানুষ হয়ে উঠেছে মো লাভের কেন্দ্রবিন্দু। বাউলরা হলেন ভাবগায়ক। তারা তাদের গানের মাধ্যমে দেখিয়ে গেছেন কিভাবে মানুষকে ভজনা করলে মুক্তির পথ সুস্পষ্ট হয়। †যমন লালন গেয়েছেন-

"অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের তুল্য কিছুই নাই

দেব দেবতাগন করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।
মন যা কর ত্বরার কর এই ভবে।”
(আবদেল: ৭১৬)

অর্থাৎ মানুষের ভেতর অনন্তরূপ দেখে মানুষকেই ভজনা করতে বলেছেন বাউল সাধকগণ। দিব্যজ্ঞানে যদি মানুষ ভজনা করা হয় তাহলেই পাওয়া যাবে অমূল্য নিধি। এভাবেই হবে জীবনের মুক্তি।

মুক্তির ধারণা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

বাংলা অঞ্চলের প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোর মুক্তির ধারণা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে মো লাভ বা মুক্তি লাভই ছিল তাদের দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ মুক্তি লাভই ছিল সম্প্রদায়গুলোর নিজ নিজ দর্শনের ল ্যর পরিণতি। এর মধ্যে এক সম্প্রদায় আবার আরেক সম্প্রদায়ের দার্শনিক চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও সাধন-পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আবার কখনো এক সম্প্রদায় থেকে নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যেখানে পূর্বের সম্প্রদায়ের চিন্তা ও সাধন-পদ্ধতি পরবর্তী সম্প্রদায়ের মাঝেও অটুট থেকেছে। তান্ত্রিক সাধকরা যেমন দেহকে তাদের মুক্তি লাভের সোপান হিসেবে ব্যবহার করেছে, তেমনি তাদের সাধন-পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে পরবর্তী সম্প্রদায়গুলো। তান্ত্রিকদের ভাণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ তত্ত্ব পরবর্তীতে সহজিয়া বৌদ্ধমত, নাথধর্ম, নব্য সূফীবাদ এবং বাউল সাধকগণ গ্রহন করেছেন। সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের সাধনার ল ্য ছিল সহজাবস্থা লাভ করা। জগৎ যে শূন্য স্বভাবের এই জ্ঞানকে বৌদ্ধ সহজিয়ারা বলছেন ‘প্রজ্ঞা’ এবং সকল জীবের প্রতি করুণা অবলম্বনকে বলছেন ‘উপায়’। উপায় এবং প্রজ্ঞা মিলেই সহজপ্রাপ্তি ঘটে। এই সহজপ্রাপ্তিই হলো তাদের কাছে মুক্তি লাভের উপায়। পরবর্তীতে বাউল সাধকরা যে ‘সহজ মানুষ’-এর কথা বলেছেন সেটি আসলে বৌদ্ধ সহজিয়াদের ‘সহজ’-এর ধারণা থেকে এসেছে তা স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সহজিয়াদের পরে নাথপন্থী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। নাথপন্থীদের মুক্তির ধারণাটি আলোচনা করলে দেখা যায় নাথপন্থী সম্প্রদায়ের উদ্ভব বৌদ্ধ সহজিয়াদের থেকে হলেও উভয় সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতির ল ্য ও উদ্দেশ্যের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ শূন্যতার জ্ঞান ও করুণা অবলম্বনের মাধ্যমে ‘সহজ’-কে পেতে চান। এই ‘সহজ’ এমন এক মানসিক অবস্থা যে অবস্থায় পৌঁছালে সাধকের কাছে সমস্ত দ্বৈততার জ্ঞান লোপ পায় এবং সাধক এক সাম্যাবস্থায় উপনীত হন। কিন্তু নাথদের ল ্য অমরত্ব লাভ, দেহকে বিনাশের হতে থেকে রক্ষা করা। এছাড়া অলৌকিক অসাধ্য সাধনও তাদের ল ্য। এরপর বাংলায় আসে সূফীরা যাদের মুক্তির পদ্ধতি ছিল যোগ সাধনার মাধ্যমে দেহের মধ্যে পরমসত্তা আল্লাহকে উপলব্ধি করা এবং তারা পরমের সাথে

নিজেকে একীভূত করতে চেয়েছেন। এভাবেই বাংলার নব্য সূফীগণ মুক্তির পথ তৈরি করেছেন। নব্য সূফীবাদের সাথে মূল সূফীবাদের পার্থক্য হচ্ছে আরবের সূফীবাদে দেহাত্মবাদী কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু বাংলার নব্য সূফীবাদে বাংলা অঞ্চলের দেহাত্মবাদী ধারণার সংমিশ্রণ ঘটে। নব্য সূফীবাদের মতে পরম দেহের মাঝেই অবস্থান করে, এই ধারণাটি আরবের সূফীবাদী ধারণা থেকে ভিন্ন। বাংলা অঞ্চলের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রাচীন যোগ সাধন-পদ্ধতি যে নব্য সূফী সাধকগণ গ্রহণ করেছেন সেটি স্পষ্টভাবেই পরিলি ত হয়। পরবর্তীতে আসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যারা কিনা পরমকে পাওয়ার জন্য যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ- এসব সাধন-পদ্ধতি বর্জন করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে এইসব সাধন-পদ্ধতি দ্বারা পরম সত্তা কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বৈষ্ণবরা পরম সত্তা কৃষ্ণকে উপলব্ধি করার এক নতুন সাধনমার্গের কথা বলেন তা হলো ভক্তিমার্গ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মনে করেন একমাত্র 'ভক্তি' দ্বারাই পরম কৃষ্ণকে বশ করা বা উপলব্ধি করা সম্ভব এবং এই ভক্তি হচ্ছে অহেতুক ভক্তি যার কোন উদ্দেশ্য নেই। এভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ ভক্তির মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। সূফীদের সাথে বৈষ্ণবদের পার্থক্য হচ্ছে, সূফীরা পরম সত্তার সাথে মিশে যেতে চান। সূফী মত অনুসারে আত্মা পরমাত্মারই খণ্ডাংশ এবং সূফী সাধকদের সাধনার ল ্য ছিল পরমের সাথে নিজ আত্মাকে একত্রিত করা অর্থাৎ সূফীদের সাধনার একটি উদ্দেশ্য ছিল বলা চলে। কিন্তু বৈষ্ণবাদের ভক্তিবাদে ভক্তি হলো অহেতুক ভক্তি। বৈষ্ণবদের পরমকে পাওয়ার জন্য যে ভক্তি সেখানে কোন হেতু নেই বা ফলাফল নেই। বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তীতে সহজিয়া বৌদ্ধ মতের সাথে মিলে 'বৈষ্ণব সহজিয়া' নামে উদ্ভূত হয়। এরাই পরবর্তীতে বাউল নামে রূপান্তরিত হয়। বাউলরা এমন এক সম্প্রদায় যারা এদের পূর্ববর্তী সকল সম্প্রদায় থেকে সাধন-পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব দর্শন তৈরি করেন। উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে তত্ত্ব-ভাবনা ও সাধনচর্চার যে দীর্ঘ ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে তার বেশিরভাগই উদ্ভূত হয়েছে শ্রেণি-বিরোধের সূত্র ধরে এবং আধিপত্যশীল শ্রেণি ও সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে। সাধনচর্চার এ ঐতিহ্যকে 'গ্রেট ট্র্যাডিশনের' বিপরীতে 'লিটল ট্র্যাডিশন' বলে আখ্যায়িত করা যায়। বাউলমত এ সমস্ত লিটল ট্র্যাডিশনের প্রায় সবগুলোকে আত্মস্থ করেই নিজ ধর্মমতের স্বাতন্ত্র সৃষ্টি করেছে (রায়হান রাইন, ২০১৯: ২৯৫)। বাউলরা দেহের মাঝে পরম ঈশ্বরকে খুঁজেছেন এবং এটাই ছিল তাদের দর্শনের ল ্য তথা মুক্তি লাভের পথ। বাউলরা দেহভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা শেষ পর্যন্ত মানুষকেই নিয়ে এসেছেন তাদের অন্বেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। নব্য সূফীগণ পরমকে দেহের মাঝে খুঁজেছেন। তবে নব্য সূফীবাদীদের সাথে বাউলদের মুক্তির পার্থক্য হলো, সূফীরা কেবল নির্জনে ধ্যান ও যোগ সাধনার মাধ্যমে পরম সত্তা আল্লাহর সাথে নিজ সত্তাকে একীভূত করতে চেয়েছেন। তবে বাউল সাধকগণ সমাজের সকলকে নিয়ে মো   লাভের পথ খুঁজেছেন। তাই তাদের চিন্তায় মানুষ হয়ে উঠেছে মো   লাভের কেন্দ্রবিন্দু। এভাবেই

প্রাক-ঔপনিবেশিক কালে বাংলা অঞ্চলের সাধক সম্প্রদায়গুলো তাদের চিন্তায় মুক্তি লাভের ধারণাকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং নিজ নিজ সাধন-পদ্ধতি দ্বারা মুক্তির পথ তৈরি করেছেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে বাংলার দার্শনিক সম্প্রদায় যেভাবেই তাদের দর্শনকে উপস্থাপন করুক না কেন প্রতি   ত্রে মো   বা মুক্তি লাভই তাদের দর্শনের মূল ল ্য এবং কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার দর্শনে যে সম্প্রদায়গুলোর আলোচনাই দেখা যায় তার প্রায় সবগুলোতেই একটিমাত্র বক্তব্য আমরা ল   না করে পারি না যে, আধ্যাত্মিক চেতনা বাঙালীর দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই চেতনাকে বাঙালীর মানস প্রাতিভার নির্দেশকও বলা চলে। এই আধ্যাত্মিকতা বা মুক্তি লাভের ধারণা শুধু বাংলার দর্শনের বৈশিষ্ট্য কেন, সমস্ত ভারতীয় দর্শনেরই মূল ল ্য। বৈদিক ও ঔপনিষদিক ষড়-দর্শনের কথাই বলা হোক অথবা নাস্তিক বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের কথাই বলা হোক, প্রতিটি সম্প্রদায়েরই সমস্যা এই জগৎ নিয়ে না, সমস্যা হচ্ছে আত্মা নিয়ে এবং আত্মার মুক্তি নিয়ে। এজন্য এই মুক্তির ধারণাকে এ অঞ্চলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলা হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই পাশ্চাত্যের দর্শনের সাথে আমাদের প্রাচ্যের দর্শনের চারিত্রিক তফাত। বাংলা অঞ্চলের দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো কখনও জীবনের মুক্তির পথ খুঁজেছে দেহ সাধনার দ্বারা বা জাগতিক উপায়ে, আবার কখনও মুক্তি খুঁজেছে পারমার্থিকভাবে পরমকে ল ্য করে। আবার কিছু সম্প্রদায় জাগতিক মুক্তির পথ বা দেহ সাধনাকে মাধ্যম ধরে পারমার্থিক মুক্তিকে ল ্য হিসেবে নিয়েছে। এসব সম্প্রদায়ের মুক্তির ধারণা পরবর্তীতে এ অঞ্চলে বিভিন্ন দার্শনিক, কবি, সাধকদের চিন্তা ও কর্মেও দেখা যায়। এ অঞ্চলে কর্মই ধর্ম, আর মুক্তি বা মো   র ধারণা এ অঞ্চলের ধর্মেরই অংশ বলা চলে। এভাবে বাংলার দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো ধর্মীয় রীতি, সাধনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনের মুক্তি খুঁজেছে।

তথ্যসূত্র

অতুল সুর (২০০৮), *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, চতুর্থ সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

অতুল সুর (১৯৮৪), *হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

আহমদ শরীফ (২০০৯), 'বাঙলার সূফীসাধনা', *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, (সম্পাদক: রায়হান রাইন), সংবেদ, ঢাকা।

আবদেল মাননান (২০১৩), *অখণ্ড লালন সঙ্গীত*, ৩য় সংস্করণ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী (১৪১৬), *বঙ্গীয় শব্দার্থ কোষ*, প্রথম খণ্ড, ভাষা বিন্যাস, কলকাতা।

ড. সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (২০০৪), *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

ড. আহমদ শরীফ (১৯৮০), 'সূফীতত্ত্ব ও দর্শন', *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, (সম্পাদকঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), নবপত্র প্রকাশ, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৪০২), *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (২০০৯), 'শাক্তধর্ম ও তন্ত্র', *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, (সম্পাদকঃ রায়হান রাইন), সংবেদ, ঢাকা।

ভোলানাথ নাথ (১৯৮০), 'নাথধর্ম', *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, (সম্পাদকঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), নবপত্র প্রকাশ, কলকাতা।

মফিজ উদ্দীন আহমদ (১৯৯৪), 'বাঙালির দার্শনিক ঐতিহ্য ও সমকাল', *বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ১ম খণ্ড, (সম্পাদকঃ শরীফ হারুন), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোঃ সোলায়মান আলী সরকার (১৯৯৪), 'বাংলার সূফীবাদঃ নব্য সূফীবাদ', *বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ১ম খণ্ড, (সম্পাদকঃ শরীফ হারুন), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৯৯), 'ধম্মপদং', *ধম্মপদ*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, (সম্পাদকঃ চারুচন্দ্র বসু), মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।

রায়হান রাইন (২০০৯), *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, সংবেদ, ঢাকা।

রায়হান রাইন (২০১৯), *বাংলার দর্শন : প্রাক্- উপনিবেশ পর্ব*, প্রথমা, ঢাকা।

শশীভূষণ দাসগুপ্ত (১৩৭৬), *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৯৮০), 'মুক্তি', *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, (সম্পাদকঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), নবপত্র প্রকাশ, কলকাতা।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৮৪), *চর্যাগীতিকা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

Edward Paul (1967), *The Encyclopedia of Philisophy*, vol 7 and 8, (ed. In chif), Macmillan Publishing co., New York.